CHINA AND COMMUNIST MOVEMENT

1.

১) প্রাক আধুনিক চীনা সমাজে জেন্ট্রি শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর। (১০/৫)

২) প্রাক আধুনিক চীনা সমাজে মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা কর। (৫)

৩) নজরানা ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখ সহ চীনে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের ইতিহাস সন্ধান কর। (১০/৫)

৪) ক্যান্টন বাণিজ্য ব্যাখ্যা কর। এই বাণিজ্য কেন ভেঙে পড়েছিল। (১০)

৫) প্রথম আফিম যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৬) প্রথম আফিম যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৭) ১৮৫৮ পর্যন্ত চীনা অর্থনীতির উপর সন্ধি ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা কর। (১০)

৮) টিয়েন্টসিনের সন্ধির গুরুত্ব আলোচনা কর। (৫)

৯) নানকিং চুক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর। (৫)

১০) "অতি আঞ্চলিক অধিকার" এবং "অতি অনুগৃহীত রাষ্ট্রের সম্মান" বলতে কী বোঝ? (৫)

১১) কমিশনার লিন সম্পর্কে টীকা লেখ। (৫)

১২) তাইপিং বিদ্রোহের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। (১০)

১৩) তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা কর। (১০)

১৪) তাইপিং বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্য ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

১৫) তাইপিং রাজ্যে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর। (৫)

১৬) নিয়েন বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি টীকা লেখ। (৫)

2.

১) তুংচি পুনঃস্থাপন কি "প্রকৃত পুনঃস্থাপন" ছিল? (১০)

২) আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৩) ১৮৯৮-এর শত দিবসের সংস্কার এর পিছনে আদর্শগত পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৪) বক্সার বিদ্রোহের পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৫) বিদেশী বিদ্রোহের বিশেষ উল্লেখসহ বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর । (১০)

৬) বক্সার ও তাইপিং বিদ্রোহ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর। (১০)

৭) চীনে ১৯১১ সালের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শগত পটভূমি আলোচনা কর। (১০)

৮) চীনে ১৯১১ সালে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে সান ইয়াৎ সেনের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ। (১০)

৯) সান ইয়াৎ সেনের তিনটি আদর্শ কি ছিল? (৫)

১০) ইউয়ান সি কাইয়ের নেতৃত্বের প্রাথমিক সাফল্য ও চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারণ দেখাও। (১০)

3.

১) মে ফোর্থ আন্দোলনের পটভুমি ব্যাখ্যা কর। চীনের ইতিহাসে এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফলগুলি কি ছিল। (১০)

২) ১৯২৮-৩৭ সালে চিয়াং কাই শেকের নেতৃত্বে নানকিং সরকারের কার্যবলীর মূল্যায়ন কর। (১০)

৩) চিয়াং কাই শেক কেন নানকিং সরকার গঠনকে পুঁজি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। (১০)

৪) চীনে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানের ইতিহাস আলোচনা কর। (১০)

৫) চীনে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানে মাও সে তুং কী ভূমিকা পালন করেছিল। (১০)

৬) আধুনিক চীনের ইতিহাসে লং মার্চের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর। (১০)

৭) চীনের কমিউনিস্ট শক্তির বৃদ্ধিতে ইয়েনান পরীক্ষা কিভাবে প্রাভব ফেলেছিল অথবা নতুন সমাজ সৃষ্টিতে এই পরীক্ষা কি সমর্থ হয়েছিল। (১০)

৮) ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের তাৎপর্য কি ছিল? (১০)

৯) "নতুন গণতন্ত্র" বলতে কি বোঝ? (৫)

4.

১) চীনের কম্প্রাডর বুর্জোয়া শ্রেণী সম্পর্কে একটি টীকা লেখ। (৫)

২) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০/৫)

৩) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর। (১০)

৪) টীকা লেখঃ গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড। (৫)

১) প্রাক আধুনিক চীনা সমাজে জেন্ট্রি শ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা কর।

- প্রাক্-আধুনিক চীনে পন্ডিত রাজকর্মচারীদের উচ্চবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বা জেন্ট্রি (Gentry) হিসাবে আখ্যায়িত করা হত। জাঁ শ্যেনো বলেছেন—"জেন্ট্রিরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে শাসক শ্রেণী ; তাঁরা তিনটি জিনিসের অধিকারী ছিলেন—ক্ষমতা, জ্ঞান এবং জমি"। তবে জেন্ট্রি শ্রেনীর প্রতিটি সদস্যই এই তিনটি জিনিসের সমান অধিকারী ছিলেন না। বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষ কনফুসীয় রীতিতে পরিচালিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতেন। অনেকেই আবার স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে জমির মালিকানা নিতে চাইতেন না। জেন্ট্রি শ্রেণীর একাংশ সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই চীনে জমি ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎস। সাধারণত কনফুসীয় ডিগ্রীধারীরা ও সরকারী পদাধিকারীরাই জমির অধিকারী হতেন। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই অল্পশিক্ষিত জমিদার ও পন্ডিত দরিদ্র ব্যক্তি দেখা যেত। তবে জেন্ট্রি শ্রেণীর সদস্যদের সামনে সম্পদ অর্জনের বহু উপায় উন্মুক্ত ছিল। সামাজিক মর্যাদার কারণেই তাঁরা সম্পদশালী শ্রেনী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

  জেন্ট্রি শ্রেণী চীনা সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন এবং বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। কনফুসীয় মন্দিরগুলির সরকারী অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদানের একমাত্র অধিকারী ছিলেন জেন্ট্রিরা। তারা পোষাক ও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব বজায় রাখতেন, যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের অনায়াসেই আলাদা করা যায়। কোন সাধারণ মানুষ কখনোই কোন জেন্ট্রিকে অপমান করতে পারতেন না। এমনকি রাজকর্মচারীরাও জেন্ট্রিদের বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকারী ছিলেন না। যে কোন বড় অপরাধের ক্ষেত্রে জেন্ট্রির সদস্যরা কম শাস্তি পেতেন। তাদের কোন্রকম কায়িক শ্রমের কাজ করতে হত না। বিশেষ সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কারণে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা পড়াশোনা ও বৌদ্ধিক কাজকর্মের সাথেই কেবল যুক্ত থাকবেন। তাছাড়া জেন্ট্রিরা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক কম কর দিতেন। জেন্ট্রিরা এক বিশেষ ধরণের বড় বাড়িতে বাস করতেন যেগুলিকে বলা হত "শেন-হু"(Gentry Household)। সাধারণ মানুষ যে সমস্ত ছোট বাড়িতে বাস করতেন সেগুলিকে বলা হত "মেন-হু"(Commoner Household)। বড় বাড়িতে বাস করা সত্ত্বেও জেন্ট্রিকে গৃহকর দিতে হত সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক কম। একজন জেন্ট্রির জমিতে অনেক চাষী কাজ করতেন কিন্তু রাষ্ট্রকে তারা চাষীদের তুলনায় অনেক কম কর দিতেন।

  আমলা ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব জেন্ট্রিদের ওপর ন্যস্ত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য জেন্ট্রিদের ওপর নির্ভর করতেন। তাছাড়া যে কোন স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা জেন্ট্রিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জেন্ট্রির সদস্যরা এলাকায় নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বাঁধ নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্থানীয় বিশ্বকোষ রচনায় সাহায্য করা, বিদ্যালয় তৈরী করে সেখানে শিক্ষাদান করা, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সাহায্য করা—এই কাজগুলিকে জেন্ট্রিরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ এবং জনকল্যাণমুলক কাজের মাধ্যমে জেন্ট্রিরা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করত। স্থানীয় আমলা বা ম্যান্ডারিনদের শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে জেন্ট্রির সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হত। স্থানীয় ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জেন্ট্রিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন।

  জেন্ট্রির সদস্যরা নিজেদের চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অভিভাবক বলে মনে করতেন। চীনের মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টিকে জেন্ট্রি শ্রেনীর সদস্যরা নিজেদের কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করতেন। এই উদ্দেশ্যে জেন্ট্রিরা বেশ কিছু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুলেছিলেন। জেন্ট্রিরা স্থানীয় গেজেটিয়ার প্রকাশ করে সেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস ও উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করতেন। সমাজে যখন বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিত, সাম্রাজ্যিক সামরিক বাহিনী অনেক সময়ই এলাকার নিরাপত্তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হত। এই ধরণের পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা বেসরকারী ফৌজ গঠন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতেন।

জমির মালিকানার সঙ্গে মানমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তির বিষয়টি জড়িত ছিল। তাই জেন্ট্রি শ্রেণী তাঁদের উদ্‌বৃত্ত পুঁজি সাধারণত জমিতেই বিনিয়োগ করতেন। তবে এই উদ্‌বৃত্ত পুঁজির উৎস ছিল বাণিজ্য। ফেয়ারব্যাঙ্ক মনে করেন জেন্ট্রি শ্রেণীকে একটি ভূস্বামী শ্রেণী হিসাবে দেখা কিঞ্চিৎ অতিসরলীকরণ। কারণ জেন্ট্রিরা একটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে কেবলমাত্র ভূসম্পত্তির ওপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিপত্তিশালী হ্যে ওথা সম্ভব না। গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পদ পাওয়ার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং ক্ষমতাবান হোয়ার অত্যাবশ্যক পূর্বশূর্ত ছিল শিক্ষা। ফেয়ারব্যাঙ্ক মন্টব্য করেছেন— "একটি শ্রেণী হিসাবে জেন্ট্রিরা জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি প্রত্যক্ষভাবে অর্জন করতেন বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে, আর পরোক্ষভাবে সম্পদ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে।

জাঁ শ্যেনো বলেছেন চীনে একটি সংবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে জেন্ট্রিদের সঙ্গে একটি শ্রেণী হিসাবে ভূস্বামীদের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল তা নিয়ে এখনো পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সেখানে একটি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেশের বৃহৎ সংখ্যক কৃষককে কতিপয় ভূস্বামীর ওপর অর্থনীতি ও অর্থনীতি বহির্ভূত দিক দিয়ে নির্ভরশীল থাকতে হত এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতে হত। আর্থিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার এই অভিনব সমন্বয়কে Joseph Needham "আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র" বা "Bureucratic Feudalism" বলে আখ্যায়িত করেছে।

বিতর্কিত বিষয়ে সালিশী করা থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক কাজে সাহায্য করা, স্থানীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা ইত্যাদি নানা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন জেন্ট্রিরা। আঞ্চলিক স্তরে তাদের কার্যাবলী অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা। একদিকে তাঁরা প্রশাসকদের স্থানীয় বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসক ও রাজকর্মচারীদের কাছে তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরতেন। প্রশাসন ও স্থানীয় মানুষ এই দুই জায়গাতেই তাদের ছিল অবাধ বিচরণ। স্থানীয় স্তরে প্রশাসকদের চাপে রাখার ক্ষমতা একমাত্র জেন্ট্রিদের ছিল। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে জেন্ট্রিরা সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অভুত্থান সংগঠিত করতেও কুন্ঠিত হতেন না। তাই বলাবাহুল্য চীনা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন জেন্ট্রিরা। তাই ইম্যানুয়েল সু চীনকে একটি "জেন্ট্রি রাষ্ট্র" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

২) নজরানা ব্যবস্থার বিশেষ উল্লেখ সহ চীনে ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের ইতিহাস সন্ধান কর।

- বৈদেশিক রাষ্ট্রসমুহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চীনাদের নিজস্ব একটি ধারণা ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীটা বর্গাকার এবং স্বর্গ গোল। পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে স্বর্গের গোল ছায়া পড়ে। সেই অঞ্চলটি স্বর্গের ঠিক নীচে অবস্থিত এবং এই অঞ্চল নিয়েই বিশাল চীন সাম্রাজ্য গঠিত। এই সাম্রাজ্যের বাইরে বসবাসকারীরা সকলেই বিদেশী বর্বর বা দানব অথবা

সামুদ্রিক দৈত্য। সুতরাং "স্বর্গের সন্তান" চীন সম্রাট কখনোই এই বিদেশী বর্বরদের সাথে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন না। এই ধারণা থেকেই চীনের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে "নজরানা পদ্ধতি"(Tribute System) প্রচলিত হয়েছিল।

চীন সম্রাট প্রাচীনকালে যখন সামন্ত প্রভূদের এবং ভূ স্বামীবর্গকে জমি দিতেন, তখন তার বিনিময়ে সামন্ত প্রভু ও ভু-স্বামীদের সম্রাটকে নজরানা পাঠাতে হত। পরবর্তীকালে চীন তার প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করে।

চীন তার দুর্বল প্রতিবেশিদের নিয়ে একটি "জাতিসমূহের পরিবার" গড়ে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবারের নেতৃত্বে ছিল চীন। অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কোরিয়া, লিউ-চিউ, আন্নাম(ভিয়েতনাম), শ্যাম, লাওস, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি। এই দেশগুলি সর্বদাই চীনের প্রাধান্য স্বীকার করে নিত। প্রাধান্যের স্বীকৃতি স্বরুপ তারা চীন সম্রাটকে নানাবিধ উপঢৌকন নজরানা হিসাবে পাঠাতে বাধ্য থাকত। এই প্রথাকেই চীনে নজরানা পদ্ধতি বলা হত।

নজরানার পরিমাণ, কোন সময়ের ব্যবধানে নজরানা পাঠাতে হবে এবং কোন পথ ধরে নজরানা চীনে আসবে—এ সবই নির্ধারিত হত চীন সম্রাটের দরবারে। যে দেশের সাথে চীনের সম্পর্ক যত বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল, সেই দেশকে তত বেশি বার উপঢৌকনসমেত নজরানা পাঠাতে হত। এই দেশগুলির সঙ্গে যে দল চীনে আসত তার সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক বণিক আসতেন বাণিজ্যপণ্য নিয়ে। এই বানিজ্যপণ্যগুলির ওপর কোন শুল্ক ধার্য করা হত না। তদুপরি নজরানাবাহী প্রতিনিধি দলের যাতায়াত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় চীন সরকার বহন করত। প্রতিনিধি দলের বণিকেরা এসে সেখানে থাকতেন, সেখানেই তাঁরা নিজ দেশের পণ্য বিক্রি করার জন্য একতি বাজার খুলতেন। চীন সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করে প্রতবেশী করদ রাজ্যগুলি যখন নজরানা পাঠাত, সেই সময় তাদের বণিকেরা বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর লাভ করতেন। তাছাড়া চীন সম্রাটও নিজের উদারতা দেখিয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের প্রচুর মূল্যবান জিনিষ উপহার দিতেন। একটি বিশেষ দিনে চীন সম্রাট বিদেশিদের কাছ থেকে নজরানা গ্রহণ করতেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা চীনা রাজদরবারে চৈনিক "কাউ-টাউ"(Kow-Tow) প্রথায় নতজানু হয়ে চীন সম্রাটকে নজরানা দিতেন।

নজরানার পরিবর্তে প্রতিবেশী দেশগুলিতে চীনও নানা ধরণের উপহার প্রেরণ করত। সমগ্র "জাতিসমূহের পরিবার"-এ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে ছিল চীন সম্রাট। করদ রাজ্যগুলিকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতেন তিনি। এক কথায় বলা যেতে পারে এইসব দেশগুলির অভিভাবকের ভূমিকা পালন করত চীন। চীন সেই সমস্ত দেশের সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করত যারা তার অভিভাবকত্ব মেনে নিত। চীন কখনোই সমতার ভিত্তিতে অন্য রাষ্টের সাথে বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করত না। চীনে যারা বাণিজ্য করতে আসত তারা মাঞ্চু সরকারের কৃপাধন্য হয়ে বাণিজ্য করত। তাই তারা কোন অধিকার দাবী করত না।

এশীয় দেশগুলির মতো পাশ্চাত্য দেশগুলিকেও চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের রাখার জন্য নজরানা পদ্ধতি মেনে চলতে হত এবং ''কাউ-টাউ" প্রথানুযায়ী নতজানু হয়ে চীন সম্রাটকে উপঢৌকন দিতে হত। পর্তুগাল, হল্যান্ড, রাশিয়া ও ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূতদের এই প্রথা মেনে নিতে হয়েছিল। ইউরোপীয় রাস্ট্রদূত এবং বণিকরা অপমানজনক নজরানা পদ্ধতি উচ্ছেদ করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—"তোমাদের কেউ এদেশে আসতে বলেনি। যদি এসেই থাক, তবে এদেশের প্রথা মানতে হবে।" তখন থেকেই ইউরোপীয়রা নজরানা প্রথার সক্রিয় বিরোধীতা আরম্ভ করেছিল।

অস্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চীনা বণিকেরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পণ্যবাহী বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতে আরম্ভ করে। এই ধরণের বাণিজ্য "জাঙ্ক বাণিজ্য"(Junk Trade) নামে পরিচিত। "জাঙ্ক" কথার অর্থ চীন দেশে বানিজ্যে ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরণের তরণি। চীন বণিকদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের কোন নজরানা দিতে হত না। সুতরাং জাঙ্ক বাণিজ্য ছিল নজরানা প্রথা বহির্ভূত। তার ফলে নজরানা প্রথার অস্তিত্ব ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া নজরানা প্রথাভিত্তিক সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। উদাহরণস্বরুপ বলা যাতে পারে কোরিয়া যখন চীনে নজরানা পাঠাত, তার ব্যাভার বহন করা চীনের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশ্চাত্য বণিকদের সক্রিয় বিরোধীতা, জাঙ্ক বাণিজ্যের প্রাধান্য এবং ব্যায়বহুলতা প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে নজরানা প্রথার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল।

৩) ক্যান্টন বাণিজ্য ব্যাখ্যা কর। এই বাণিজ্য কেন ভেঙে পড়েছিল।

- চীনের সাথে পাশ্চাত্য দেশগুলির সম্পর্কের ইতিহাসে ক্যান্টন একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে তাং যুগ(৬১৮-৯০৭) থেকেই ক্যান্টন বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ক্যান্টন ব্যাতীত অন্য চীনা বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিদেশী বণিকদের যথেষ্ঠ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ক্যান্টনে বাণিজ্য করতে হত। চীনারা কখনোই বিদেশীদের নিজেদের সমপর্যায়ের বলে মনে করত না তাই তারা ক্যান্টনে বাণিজ্যরত বিদেশীদের উপর কতকগুলি কঠিন শর্ত আরোপ করে।

  অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় বণিকদের সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্যান্টন প্রথার দ্বারাই পরিচালিত হত। পাশ্চাত্য বণিকদের কাছে ক্যান্টন ছিল একমাত্র উন্মুক্ত বন্দর। ক্যান্টন শহরে কতকগুলি চীনা বাণিজ্যিক সংস্থা একত্রিত হয়ে "কো-হং" (Co-Hong) নামে একটি সংগঠন তৈরী করেছিল। এই সংগঠন ক্যান্টন অঞ্চলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের অধিকারী ছিল। কো-হং-এর সদস্যরা হং বণিক নামে পরিচিত ছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যপণ্যের পরিমাণ এবং মূল্য নির্ধারণ করতেন কো-হং। পাশ্চাত্য বণিকদের বাণিজ্যিক এবং সাধারণ কার্যকলাপের জন্য কো-হং ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকত। ক্যান্টন বাণিজ্যের মাধ্যমে হং বণিকেরা প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জন করতেন। বিখ্যাত চীনা বিশেষজ্ঞ এবং ফরাসী ঐতিহাসিক জাঁ শ্যেনো বলেছেন, ক্যান্টনে তাদের বিশেষ অবস্থানের সূযোগ নিয়ে হং বণিকেরা নিজেদের প্রবল প্রতিপত্তিশালী এক ধরণের "বণিক অভিজাততন্ত্রে" উন্নীত করেছিলেন।

  চীনা আদালত ১৩টি হং বাণিজ্যিক সংস্থার উপর ক্যান্টন শহরের যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার একমাত্র ও পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিল। এই হং সংস্থাগুলির পাশাপাশি পাশ্চাত্য বণিকেরা ক্যান্টপ্ন নদীর তীরে ১৩টি বৈদেশিক সংস্থা গরে তুলেছিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আমেরিকান, ড্যানিশ প্রভৃতি বণিকেরা এই সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন। চীনারা এই বিদেশী সংস্থাগুলিকে অত্যন্ত নীচু নজরে দেখতেন এবং এইগিলিকে "আই-কুয়ান" বা "বর্বরদের সংস্থা' হিসাবে অভিহিত করতেন। বিদেশীরা হং বণিকদের কাছ থেকে

রেশম, চা, নানকিন (এক ধরণের সুতিবস্ত্র, যা চীনের নানকিং এ তৈরী হত) প্রভৃতি পণ্য ক্রয় করে ইউরোপে রপ্তানী করত। ক্যান্টন বাণিজ্যে চা ব্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল।

বিদেশীরা মনে করতেন যে, পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চীন পশ্চিমী বণিকদের প্রতি এক ধরনের "রুদ্ধদ্বার নীতি" গ্রহণ করেছে। কিন্তু চীনের আমলাতন্ত্র মনে করত রুদ্ধদ্বার নীতি নয়, বিদেশী বণিকদের প্রতিপত্তি চীনে যেন বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য তাদের উপর এক ধরণের "নিয়ন্ত্রণ" আরোপ করা হত। জাঁ শ্যেনো এক্ষেত্রে "নিয়ন্ত্রণ" সব্দটিকেই যথার্থ ও সঠিক বলে মনে করেছেন। মধ্যযুগীয় চীনে আরব বণিকদেরও ক্যান্তন অঞ্চলে এইরকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ব্যবসা করতে হত।

বিদেশীদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চীনা ও বিদেশীদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল। তার উপর আইন প্রয়োগের সমস্যা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিল। চীনের সরকার দাবী করেছিল, ক্যান্টনে বাণিজ্যরত বিদেশী অপরাধীদের চীনা আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে। কিন্তু বিদেশীরা এই নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। এত কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিদেশীরা ক্যান্টনে তাদের বাণিজ্য চালিয়ে গিয়েছিল কারণ তাদের কাছে ক্যান্টন বাণিজ্য ছিল অবিশ্বাস্য রকমের লাভজনক।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার কঠোর নিয়মকানুঙ্গুলি শিথিল করা এবং চীনের সাথে একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার কর্নেল ক্যাথকার্টকে পিকিং-এ পাঠায়। কিন্তু পথেই ক্যাথকার্টের মৃত্যু হয়। তারপর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একই উদ্দেশ্যে লর্ড ম্যাকার্টনিকে চীনে পাঠায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ম্যাকার্টনি ইঙ্গ-চীন বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু চীনা সম্রাট চিয়েন লুং এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরেজ সরকার সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালায় ১৮১৬ খ্রিস্তাব্দে। চীনের সাথে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার লর্ড আমহার্স্টকে পিকিং-এর রাজদরবারে প্রেরণ করে। কিন্তু এই প্রয়াসও ব্যার্থ হয়। ইংল্যান্ডের এই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসের পেছনে মূল উদ্দেশয় ছিল, চীনে ব্রিটিশ বণিকদের অবাধ বিচরণের পথ পরিষ্কার করা। পুঁজিবাদী ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার তাগিদে রুদ্ধদ্বার চীনকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছিল। সুতরাং আধুনিক ধনতান্ত্রিক পশ্চিমের সাথে পিছিয়ে থাকা, সামন্ততান্ত্রিক চীনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ ও আমেরিকার নণিকরা চীনে আফিমের চোরা ব্যবসা শুরু করলেন। চীনের সাধারণ মানুষ আফিমের নেশায় ক্রমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিদেশী বণিকদের কাছে আফিমের বেআইনি ব্যবসা অসম্ভব লাভজনক হয়ে ওঠে। আফিমের বিনিময়ে তারা চীনের মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীনা কর্তৃপক্ষ আফিম ব্যবসায় বাধা দেন। এই অবৈধ আফিম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ১৮৩৯ সালে আফিম যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে চীনের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার অবসান ঘটে।

৪) প্রথম আফিম যুদ্ধের পটভুমি সম্পর্কে আলোচনা কর।

- সপ্তম ও অষ্টম শতকে চীনে আফিমের প্রচলন করেছিলেন তুর্কী এবং আরব বণিকেরা। কিন্তু চীনারা ওষুধ হিসাবে আফিমের ব্যবহার করতেন; নেশার জিনিস হিসাবে আফিমের ব্যবহার

তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চীনে আফিমের ব্যবহার মারাত্মক রকমের বেড়ে গিয়েছিল। ফলে চীনে আফিমের চাহিদারও বৃদ্ধি হয়েছিল। চীনে আফিমের চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে।

ইংল্যান্ড রুদ্ধদ্বার চীনকে উন্মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তাকে মদত দিয়েছিল অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তবর্গ। ইংল্যান্ড চীনের সাথে একটি বাণিজ্যিক ভারসাম্য গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ সহ অন্যান্য পাশ্চাত্য বণিকরা সকলেই চীনের থেকে দ্রব্য ক্রয় করে রৌপ্যের মাধ্যমে তার দাম মেটাত। কিন্তু পাশ্চাত্য বণিকদের কাছে বিষয়টি লাভজনক ছিল না। তারা তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু চীনারা কখনোই পশ্চিমী পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ছিল না, যেহেতু তাদের নিজের দেশে নানা ধরনের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হত। সুতরাং চীনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখার জন্য ও চীন থেকে পণ্য ক্রয় করে রপ্তানীর জন্য, পশ্চিমী বণিকদের রৌপ্য দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকান বণিকেরা নিজেদের লাভের মাত্রা বাড়ানোর জন্য এক অভিনব উপায় বের করেন। তাঁরা চীনের অভ্যন্তরে আফিমের চোরাচালান করতে লাগলেন। এই চোরাই চালান আরম্ভ হয়েছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। ইংরেজ বণিকেরা অত্যন্ত সস্তায় আফিম ক্রয় করতেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ভারতবর্ষের বাংলাদেশ থেকে। আমেরিকাম বণিকেরা কিনতেন তুরস্ক থেকে। আফিমের চোরাই পাচারের ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চীনের মানুষ আফিমের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়লেন। চীনে আফিমের বেআইনি ব্যবসা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। আফিম গ্রহণ করার পরিবর্তে চীনারা ইংরেজ বণিকদের চা, রেশম, চীনামাটির বাসন(Porcelain) ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী দিতে লাগলেন। কিন্তু আফিমের চাহিদা চীনে এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, এত সব জিনিস দিয়েও বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হল না। তখন চীনারা রৌপ্য দিয়ে আফিম ক্রয় করতে লাগলেন। কিছুদিন আগেও চীনা বণিকেরা রুপার বিনিময়ে নিজের দেশের পণ্যসামগ্রী বিদেশী বণিকদের কাছে বিক্রি করত। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আফিম আমদানী করতে গিয়ে তাদের নিজেদের দেশের রৌপ্য বিদেশে চলে যেতে লাগল। বিদেশী বণিকদের দ্বারা চীনে আফিম পাচারের ফলে একদিকে নেশায় আসক্ত চীনাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটল, অন্যদিকে চীনের অর্থনীতি যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

কিছুদিনের মধ্যেই মাঞ্চু সরকার বেআইনি আফিম ব্যবসার মারাত্মক কুফলের কথা উপলব্ধি করল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন চীন সম্রাট চীনে আফিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু ততদিনে প্রচুর সংখ্যক চীনা আফিমে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং অসংখ্য ব্যবসায়ী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারী এই অনৈতিক ব্যবসার সাথে নিজেদের যুক্ত করে বিরাট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ফলে এই নিষিদ্ধকরণ চীনে আফিম প্রবেশ করতে পারল না। চোরাই চালান এবং উৎকোচ আফিম ব্যবসার নিষিদ্ধকরণের পর চীনে আফিমের আমদানি আরও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২০ মিলিয়ন আউন্স রুপা বিদেশে চলে গিয়েছিল।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চীন ৩৮ মিলিয়ন স্পেনীয় ডলার রৌপ্যের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চীনের সমগ্র আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ ছিল আফিম। চীনের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এই পঙ্গু অর্থনীতির চাপ এসে পড়েছিল মূলত কৃষকশ্রেণীর উপর। প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য দেশ থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার ফলে, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পেতে আরম্ভ করেছিল। অন্যদিকে ভূস্বামী এবং কর আদায়কারীরা নিজেদের আয় এবং জীবনযাত্রার মান নীচে না

নামে, সেইজন্য কৃষকদের থেকে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে চীনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে এক নয়া সংকট দেখা দেয়। এই সংকটের ফলশ্রুতি হিসাবে চীনে কৃষক বিদ্রোহের এক নতুন আবর্তের আবির্ভাব ঘটল। মাঞ্চু সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান ঘন ঘন হতে লাগল ১৮১০ খ্রিঃ থেকে।

১৮৩০ খ্রিঃ নাগাদ ক্যান্টন অঞ্চলে বিদেশী বণিক ও চীনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেছিল। মাঝে মধ্যেই দুপক্ষ ছোটখাটো সংঘর্ষে লিপ্ত হত। সাধারণত বকেয়া ঋণ ও চীনাদের বিচারব্যবস্থা নিয়েই ঝামেলা হত। ১৮৩৫ সালে মাঞ্চু শাসক বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করারা জন্য এবং আফিমের চোরা কারবার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কঠোর আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আফিমের বেআওনি ব্যবসা বন্ধ করা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মাঞ্চু শাসকদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে আফিমের চোরা চালান বন্ধ করার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। লিন-সে-সু নামে এক দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিক রাজকর্মচারীকে ক্যান্টনের বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত করা হল। ১৮৩৯ খ্রিঃ লিন বেআইনি আফিম ব্যবসা বন্ধ করার ও মুৎসুদ্দি ও ভৃত্যদের আফিম বাণিজ্যের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য ব্রিটিশ কুঠি বা ফ্যাক্টরিগুলিকে অবরোধ করার নির্দেশ দেয়। লিন ইংরেজ বণিকদের কাছে গচ্ছিত যাবতীয় আফিম লিন তাঁর হেফাজতে সমর্পণ করার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতির চাপে বিদেসী বণিকরা প্রায় ২১০০০ পেটি আফিম লিনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। ১৮৩৯ খ্রিঃ ৩রা জুন লিন জনসমক্ষে বিপুল পরিমাণ আফিম ধ্বংস করেন। ১২ ই জুলাই ব্রিটিশ নাবিকদের হাতে এক চীনা গ্রামবাসী নিহত হন। তৎক্ষণাৎ লিন অপরাধীদের চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্রিটিশ বণিকদের তাদানীন্তন প্রতিনিধি এলিয়ট এই নির্দেশের বিরোধীতা করেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ প্রজাদের বিচার করার কোন এক্তিয়ার চীনা কর্তৃপক্ষের নেই। লিন পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে ব্রিটিশদের ম্যাকাও থেকে বহিস্কৃত করার জন্য চাপ দেন। ১৮৩৯ খ্রিঃ ২৬ শে আগস্ট সমস্ত ব্রিটিশ প্রজা ক্যান্টন থেকে ৯০ মাইল দূরে হংকং-এ চলে যান।

কিন্তু ১৮৪০ খ্রিঃ জুন মাসে এডমিরাল এলিয়টের নেতৃত্বে ইংরেজরা প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চীন আক্রমণ করে। চীনারা এই আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর হন। প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সূচনা হয়। ইমান্যুয়েল স্যু বলেছেন, "এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চীনারা বেআইনি আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন"। তাই ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধকে প্রথম আফিম যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ভিনাক বলেছেন, আফিম কখনোই এই যুদ্ধের কারণ ছিল না, ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। যুদ্ধের মূল কারণ নিহিত ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে এবং বিদেশীদের কাছে অপমানজক ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার শর্তাবলীর মধ্যে। ঐতিহাসিক ফেয়ারব্যাঙ্ক বলেছেন, আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে চীনের জেহাদ ও নজরানা পদ্ধতির বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সক্রিয় বিরোধীতা এই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। চীনা ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুংগ্রামে চীনা জনগনের প্রথম পদক্ষেও বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই যুদ্ধে শেষপর্যন্ত চীন পরাজিত হয় এবং অসম নানকিং-এর সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।

৫) প্রথম আফিম যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

- প্রথম আফিম যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে চীনকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সাথে কতকগুলি অপমানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। চীনের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা চুক্তিব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই চুক্তি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে চীন একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগে প্রবেশ করে। চীন একটি ''আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক" রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

  প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজয় ও তারপর চুক্তি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের ফলে চীনের স্বাধীনতা ও সার্বপভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। হংকং ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় চীনের আঞ্চলিক অখন্ডতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, চুক্তি ব্যবস্থার ফলে চীন বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার অধিকার হারিয়েছিল। চীনে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে "অতি আঞ্চলিক অধিকার" স্বীকার করে নিতে এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে "সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ"-এর মর্যাদা দিতে চীন বাধ্য হয়েছিল। এ সবই ছিল চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। ১৮৪২ খ্রিঃ থেকে ১৮৪৪ খ্রিঃ মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীনের দূর্বলতার সূযোগে কতকগুলি সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল ৪টি অসম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। চুক্তি ব্যবস্থার সূচনার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনে নজরানা প্রথার অবসান ঘটেছিল।

  প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনের অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আফিমের চোরাই চালান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকৃত হংকং আফিম চোরাকারবারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। চীনের অভ্যন্তরে আফিমের পাচার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে চীনা জনগণের নৈতিক অধঃপতন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি একই সাথে হতে থাকে। তাছাড়া, বিদেশী বণিকদের কাছে চীনের পাঁচটি বন্দর উন্মুক্ত হওয়ার ফলে এবং বিদেশী পণ্যের উপর অত্যল্প বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করতে বাধ্য থাকার ফলে বিদেশী পণ্য চীনের বাজার ছেয়ে ফেলে। বিশেষত, বিদেশী বস্ত্র এবং সুতো চীনের বাজার দখল করে নেয়, ফলে চীনের হস্তশিল্প ধ্বংসের সন্মুখীন হয়। আধুনিক চীনের রুপকার মাও সে তুং তাঁর "The Chinese Revolution and the Chinese Communist Party" প্রবন্ধে বলেছেন, "চীনের সামাজিক অর্থনীতি ভেঙে ফেলার ব্যাপারে বিদেশী পুঁজি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একদিকে বিদেশী পুঁজি চীনের স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল, অন্যদিকে তা চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলের ধ্বংসসাধন করেছিল।" সমগ্র চীনের শহর ও গ্রামাঞ্চলে পণ্যনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনের রাজনৈতিক স্বার্বভৌমত্বের সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লুপ্ত হয়েছিল।

৬) ১৮৫৮ পর্যন্ত চীনা অর্থনীতির উপর সন্ধি ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা কর।

- প্রথম আফিম যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে চীনকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সাথে কতকগুলি অপমানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। চীনের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা চুক্তিব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই চুক্তি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়ে চীন একটি সম্পূর্ণ নতুন যুগে প্রবেশ করে। চীন একটি ''আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক" রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

  প্রথম আফিম যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে চীনের পরাজয়ের পর চীনের শাসক শ্রেণী কতকগুলি অপমানজনক শর্ত নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি "অসম চুক্তি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি নানকিং-এর সন্ধি চুক্তি নামে খ্যাত। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের নানকিং চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আফিম যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির শর্তগুলি নিম্নরুপঃ

১) ইংরেজরা চীনের কাছ থেকে মোট ২১ মিলিয়ান রৌপ্য ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে লাভ করে।

২) ক্যান্টনে কো-হং-এর একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটে।

৩) ক্যান্টন, এময়, ফু-চাও, নিংপো, সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর ইংরেজদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

৪) হংকং ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

৫) দুই তরফের মধ্যে সরকারি চিঠিপত্রের ব্যাপারে সমতা স্বীকৃত হয়।

৬) বিদেশী পণ্যের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ধার্য করা হবে।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর নানকিং চুক্তির সম্পূরক একট সন্ধি-চুক্তি চীন ও ইংরেজদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি Treaty of the Bouge নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যে,

১) আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৪ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হবে।

২) ব্রিটিশরা চীনে "অতি আঞ্চলিক অধিকার" লাভ করে অর্থাৎ ব্রিটিশ কনসালরা চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করার অধিকার লাভ করে।

৩) ইংল্যান্ডকে চীনে সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়।

বোগের সন্ধি-চুক্তিকে হুমেনের সন্ধি-চুক্তি নামেও অভিহিত করা হয়।

নানকিং-এর সন্ধি চুক্তির পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বণিকরা চীনে কিছু সুবিধা আদায় করার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারা মাঞ্চু সরকারের আর্জি রাখেন যে, চীন ব্রিটিশ বণিকদের যে সুবিধাগুলি দিয়েছে তা আমেরিকার বণিকদেরও দিতে হবে। এর অন্যথা হলে চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকা আগ্রাসী নীতি গ্রহন করতে বাধ্য হবে। ১৮৪৪ খ্রিঃ আমেরিকার যুদ্ধজাহাজ চীন অভিমুখে আসতে আরম্ভ করলে ভীত চীনা কর্তৃপক্ষ এক অসম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ১৮৪৪ খ্রিঃ ৩রা জুলাই চীন ও আমেরিকার মধ্যে ওয়াংশিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তে বলা হয়ঃ

১) চীনে বসবাসকারী মার্কিন নাগরিকের বিচার করবেন আমেরিকান কনসাল। একজন আমেরিকান অপরাধীকে বিচার করার কোন এক্তিয়ার চীনা আদালতের থাকবে না।

২) শুল্ক ধার্য করার সময় চীন সরকার আমেরিকান কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য থাকবে অর্থাৎ এর ফলে শুল্ক ধার্য করার স্বাধিকার চীন সরকার হারাতে বাধ্য হয়।

৩) চীন সরকারের অনুমতি ছাড়াই বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ চীনে প্রবেশ ও ত্যাগ করতে পারবে।

এরপর ফরাসীরাও চীনে সুবিধা আদায়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ১৮৪৪ খ্রিঃ চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে হোয়াম্পোয়ার সন্ধি চুক্তি (Treaty of Whampoa) নামে পরিচিত। ইংরেজরা নানকিং-এর সন্ধির মাধ্যমে এবং আমেরিকানরা ওয়াংশিয়া সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা লভ করেছিল, ফরাসীরা হোয়াম্পোয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সে সুযোগ সুবিধা লাভ করে। উপরন্তু আমেরিকা ও ফরাসীরা চীনে গির্জা প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচারের সুযোগ লাভ করে যার ফলে চীনে তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আরও বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের যে ওয়াংশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে অন্যতম শর্ত ছিল যে, ১২ বছর পরে এই চুক্তির পুনর্বিন্যাস করা হবে। হোয়াম্পোয়ার সন্ধির মাধ্যমেও ফ্রান্স চীনের কাছ থেকে একই শর্ত আদায় করে নিয়েছিল। ইংল্যান্ড যেহেতু ''সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ"-এর মর্যাদা লাভ করেছিল , তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ডও নানকিং চুক্তির পুনর্বিন্যাসের অধিকারী ছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ও ফ্রান্স চীন কর্তৃপক্ষের কাছে চুক্তি সংশোধনের দাবী জানায়। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনের

পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। তারা সমগ্র চীনে বাণিজ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু চীনারা কোনমতেই এই দাবী মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে বিদেশীদের সাথে চীনের সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে আর একটি যুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়।

১৮৫৭ খ্রিঃ ২৮ শে ডিসেম্বর ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনী ঝড়ের গতিতে ক্যান্টন শহর দখল করে নেয়। পিকিং আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় চীনারা একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৮ খ্রিঃ জুন মাসে তিয়েন্তসিনের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী চীন নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়ঃ

১) এখন থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গ কূটনৈতিক সমতার ভিত্তিতে একজন করে মন্ত্রী পিকিং-এ স্থায়ীভাবে রাখতে পারবে।

২) আরও নতুন দশটি বন্দর বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

৩) বিদেশীরা চীনের সর্বত্র নিজেদের কনসালদের অনুমতি সাপেক্ষে ভ্রমণের অধিকার লাভ করে।

৪) চীনা কর্তৃপক্ষ আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের উপর অভ্যন্তরীণ শুল্ক পণ্যমূল্যের ২.৫ শতাংশের বেশী ধার্য করতে পারবে না।

৫) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীন ব্রিটেনকে ৪ মিলিয়ান টেইল ও ফ্রান্সকে ২ মিলিয়ান টেইল দিতে সম্মত হয়।

৬) ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা চীনের সর্বত্র অবাধ বিচরণের অধিকার অর্জন করে।

চুক্তি ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশের ফলে চীনের স্বাধীনতা ও সার্বপভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। হংকং ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় চীনের আঞ্চলিক অখন্ডতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, চুক্তি ব্যবস্থার ফলে চীন বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার অধিকার হারিয়েছিল। চীনে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে "অতি আঞ্চলিক অধিকার" স্বীকার করে নিতে এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে "সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ"-এর মর্যাদা দিতে চীন বাধ্য হয়েছিল। এ সবই ছিল চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। ১৮৪২ খ্রিঃ থেকে ১৮৪৪ খ্রিঃ মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীনের দূর্বলতার সূযোগে কতকগুলি সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল ৪টি অসম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। চুক্তি ব্যবস্থার সূচনার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনে নজরানা প্রথার অবসান ঘটেছিল।

৭) নানকিং চুক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর।

- প্রথম আফিম যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে চীনের পরাজয়ের পর চীনের শাসক শ্রেণী কতকগুলি অপমানজনক শর্ত নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে একটি "অসম চুক্তি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি নানকিং-এর সন্ধি চুক্তি নামে খ্যাত। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের নানকিং চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আফিম যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সন্ধির শর্তগুলি নিম্নরুপঃ

১) ইংরেজরা চীনের কাছ থেকে মোট ২১ মিলিয়ান রৌপ্য ডলার ক্ষতিপূরণ হিসেবে লাভ করে।

২) ক্যান্টনে কো-হং-এর একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্যের অবসান ঘটে।

৩) ক্যান্টন, এময়, ফু-চাও, নিংপো, সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর ইংরেজদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

৪) হংকং ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

৫) দুই তরফের মধ্যে সরকারি চিঠিপত্রের ব্যাপারে সমতা স্বীকৃত হয়।

৬) বিদেশী পণ্যের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ধার্য করা হবে।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর নানকিং চুক্তির সম্পূরক একট সন্ধি-চুক্তি চীন ও ইংরেজদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি Treaty of the Bouge নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যে,

১) আমদানীকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৪ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হবে।

২) ব্রিটিশরা চীনে "অতি আঞ্চলিক অধিকার" লাভ করে অর্থাৎ ব্রিটিশ কনসালরা চীনে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করার অধিকার লাভ করে।

৩) ইংল্যান্ডকে চীনে সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশের মর্যাদা দেওয়া হয়।

নানকিং চুক্তির ফলে চীনের স্বাধীনতা ও সার্বপভৌমত্ব বিনষ্ট হয়। হংকং ব্রিটিশদের হাতে চলে যাওয়ায় চীনের আঞ্চলিক অখন্ডতা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া, চুক্তি ব্যবস্থার ফলে চীন বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার অধিকার হারিয়েছিল। চীনে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিকদের ক্ষেত্রে "অতি আঞ্চলিক অধিকার" স্বীকার করে নিতে এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রকে "সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ"-এর মর্যাদা দিতে চীন বাধ্য হয়েছিল। এ সবই ছিল চীনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। ১৮৪২ খ্রিঃ থেকে ১৮৪৪ খ্রিঃ মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীনের দূর্বলতার সূযোগে কতকগুলি সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল ৪টি অসম চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে। চুক্তি ব্যবস্থার সূচনার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনে নজরানা প্রথার অবসান ঘটেছিল।

৮) টিয়েন্টসিনের সন্ধির গুরুত্ব আলোচনা কর।

- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের যে ওয়াংশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে অন্যতম শর্ত ছিল যে, ১২ বছর পরে এই চুক্তির পুনর্বিন্যাস করা হবে। হোয়াম্পোয়ার সন্ধির মাধ্যমেও ফ্রান্স চীনের কাছ থেকে একই শর্ত আদায় করে নিয়েছিল। ইংল্যান্ড যেহেতু ''সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত দেশ"-এর মর্যাদা লাভ করেছিল , তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ডও নানকিং চুক্তির পুনর্বিন্যাসের অধিকারী ছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন ও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ও ফ্রান্স চীন কর্তৃপক্ষের কাছে চুক্তি সংশোধনের দাবী জানায়। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চীনের পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েও সন্তুষ্ট হয়নি। তারা সমগ্র চীনে বাণিজ্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু চীনারা কোনমতেই এই দাবী মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে বিদেশীদের সাথে চীনের সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে আর একটি যুদ্ধের পথ প্রশস্ত হয়।

  ১৮৫৭ খ্রিঃ ২৮ শে ডিসেম্বর ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনী ঝড়ের গতিতে ক্যান্টন শহর দখল করে নেয়। পিকিং আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় চীনারা একটি সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৮ খ্রিঃ জুন মাসে তিয়েন্তসিনের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী চীন নিম্নলিখিত শর্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়ঃ

  ১) এখন থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গ কূটনৈতিক সমতার ভিত্তিতে একজন করে মন্ত্রী পিকিং-এ স্থায়ীভাবে রাখতে পারবে।

  ২) আরও নতুন দশটি বন্দর বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

৩) বিদেশীরা চীনের সর্বত্র নিজেদের কনসালদের অনুমতি সাপেক্ষে ভ্রমণের অধিকার লাভ করে।

৪) চীনা কর্তৃপক্ষ আমদানীকৃত বিদেশী পণ্যের উপর অভ্যন্তরীণ শুল্ক পণ্যমূল্যের ২.৫ শতাংশের বেশী ধার্য করতে পারবে না।

৫) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ চীন ব্রিটেনকে ৪ মিলিয়ান টেইল ও ফ্রান্সকে ২ মিলিয়ান টেইল দিতে সম্মত হয়।

৬) ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা চীনের সর্বত্র অবাধ বিচরণের অধিকার অর্জন করে।

নানকিং চুক্তির ফলে চীনে যে ঔপনিবেশিকতার সূচনা হয়েছিল টিয়েন্টসিনের সন্ধির মাধ্যমে তা আরও দৃঢ়তর হয়। দশটি নতুন বন্দর উন্মুক্ত হওয়ার ফলে চীনের আর্থিক শোষণ আরও বৃদ্ধি পায়। পিকিং রাজদরবারে বিদেশী মন্ত্রীর অবস্থান ছিল চীনের সার্বভৌমিকতার উপর চরম আঘাত। তাছাড়া চীনের অভ্যন্তরে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবাধ যাতায়াত চীনে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের পথ আরও প্রশস্ত করেছিল।

৯) তাইপিং বিদ্রোহের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

- ১৮৪০ খ্রিঃ প্রথম আফিম যুদ্ধের পর চীনে বিদেশী পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাথে বিদেশী পুঁজির আঘাত যুক্ত হয়ে চীনের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। চীনা সমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছিল এবং নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল।

  আফিমের চোরাই চালান চীনা অর্থনীতিকে ব্যপক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। আফিম আমদানির মূল্য হিসাবে চীন থেকে প্রভূত পরিমাণ রৌপ্য বিদেশে চলে যেতে থাকে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ খ্রিঃ মধ্যে চীন থেকে প্রতি বছর গড়ে ২০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টেইল মূল্যের রৌপ্য বিদেশে চলে যেত। হুং শিউ চুয়ান যখন বিদ্রোহের ডাক দেন, তখন তিনি আফিমের বিনিময়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য নষ্ট করার জন্য চিং সরকারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন।

  দেশের রৌপ্য বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার বিনিময় মূল্যে বিরাট ফারাক দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রতিটি টেইলের বিনিময় মূল্য ছিল ১০০০ তাম্রমুদ্রা। ১৮৪০ খ্রিঃ নাগাদ রি বিনিময় মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ১৬০০ তাম্রমুদ্রা। ১৮৫০ খ্রিঃ নাগাদ প্রতি রুপার টেইলের বিনিময় মূল্য হয় ২২০০ থেকে ২৩০০ তাম্রমুদ্রা। সুতরাং আফিমের চোরাচালানের ফলে এই বিনিময় মূল্যের বৃদ্ধি ১০০ শতাংশের বেশি হয়েছিল। কৃষকেরা ও কারিগরেরা তাঁদের মজুরি বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পেতেন তাম্রমুদ্রার মাধ্যমে। অথচ তাঁদের রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে অথবা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময় মূল্য অনুযায়ী কর দিতে হত। ফলে করের হার অপরিবর্তিত থাকলেও করের বোঝা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

  প্রথম আফিম যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে নানকিং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চীনের পাঁচটি বন্দর বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ঐ বন্দরগুলি দিয়ে বিদেশী পণ্য স্রোতের মতো ঢুকতে থাকে। বিশেষত, বিদেশী সূতিবস্ত্র চীনের বাজার ছেয়ে ফেলে। চীনের হস্তনির্মিত সূতিবস্ত্র হ্রাস পায়। কিছুদিনের মধ্যেই দেশীয় হস্তশিল্পের বিনাশ ঘটতে থাকে। দেশীয় হস্তশিল্পী

ও কারিগরের কাজ হারাতে থাকেন। এইসব কর্মচ্যুত, জীবনযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে তাইপিং বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দর, বিশেষত, সাংহাই বন্দর উন্মুক্ত হবার ফলে চীনের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়েছিল। ইয়াংসি অঞ্চল থেকে পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্য এখন সাংহাই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হতে থাকে। বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্যান্টনের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হবার পর মাল বহনের কাজে নিযুক্ত হাজার হাজার নৌকার মাঝি ও কুলি বেকার হয়ে পড়েন। জাঁ শ্যেনো বলেছেন, এই কর্মহীন মাঝি ও কুলিদের থেকে তাইপিং বিদ্রোহের সেরা কর্মীবাহিনী এসেছিল। বিদ্রোহের দুজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ইয়াং শিউ-চিং এবং শিয়াও চাও-কুই আগে ইয়াংসি অঞ্চলে কুলির কাজ করতেন।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটিশ নৌবাহিনী চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলদস্যুবৃত্তি বন্ধ করার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত জলদস্যু ও তাদের সঙ্গীরা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে উপকূলবর্তী অঞ্চল ছেড়ে চীনের অভ্যন্তরে চলে আসে। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত এইসব ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়েছিল। মাঞ্চু বিরোধী তাইপিং বিদ্রোহেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

করভারে জর্জরিত কৃষকেরা কর দিতে অস্বীকার করায় তাঁরা রাজপুরুষদের নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তাঁরা জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। চীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ বয়নশিল্পের ধ্বংসের ফলে কারিগরেরা বেকার হয়ে যান। কর্মচ্যুত কুলি, মাঝি ও অপরাধ জগতের লোকেরা কাজের সংস্থানের জন্য ভবঘুরে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। কিন্তু চীনে যেহেতু আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠেনি, তাই তাঁদের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়নি। এই কর্মহীন দরিদ্র মানুষেরা একটি মাঞ্চু-বিরোধী বিদ্রোহের জন্য তৈরী হয়েছিলেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় চীনের অর্থনৈতিক দুর্গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাজপুরুষদের অদক্ষতা, খরা, নানা ধরনের কৃষির বিপত্তির ফলে ১৮৪০-এর দশকের শেষের দিকে চীনে কতকগুলি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাইপিং বিদ্রোহের পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছিল।

দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত মাঞ্চু শাসন তাইপিং বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করেছিল। বিদেশী আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি প্রকট করে তুলেছিল। তাছাড়া মাঞ্চু সামরিক ব্যবস্থাতেও যথেষ্ঠ গলদ দেখা দিয়েছিল। প্রথম আফিম যুদ্ধে অপমানজনক পরাজয় সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। সাধারণ সৈন্যরা নেতাদের নির্দেশ মানত না। সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা মাঞ্চু শাসন বিরোধী দরিদ্র ব্যক্তিদের বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস যুগিয়েছিল।

দক্ষিণ চীনে মাঞ্চু শাসনের ভিত্তি কখনোই সুদৃঢ় ছিল না। তাছাড়া, ইয়াংস্যার দক্ষিণে ইউরোপীয়দের বসবাসের ফলে সেখানে পশ্চিমের প্রভাব পড়েছিল। বিশেষত খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যাবলী তাইপিং বিদ্রোহীদের অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া এইসব অঞ্চলে দারিদ্র ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সব মিলিয়ে দক্ষিণ চিনে মাঞ্চু বিরোধী সংগ্রামের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। তাই জাঁ শ্যেনো যথার্থই বলেছেন, "South China was the cradle of the Taiping Rebellion."

১০) তাইপিং বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা কর।

- সমাজবিজ্ঞানী মানবেন্দ্রনাথ রায় তাইপিং বিদ্রোহকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বুপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাথে তাইপিং বিদ্রোহের সাদৃশ্য খুজে পেয়েছেন। কারণ তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লবের মতন তাইপিং বিদ্রোহেরও নেতৃত্ব দিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণী এবং পরবর্তী স্তরে কৃষকরা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই বক্তব্যের বিরোধীতা করেছেন। তাদের মতে, অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের মতো চীনে বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। তাই তাইপিং বিদ্রোহকে কোনমতেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিদ্রোহ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না।

  জার্মান পন্ডিত Wolfgang Frank বলেছেন, তাইপিং বিদ্রোহের নেতৃত্বের দিকটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই বিদ্রোহের প্রথম সারির প্রায় সব নেতাই উঠে এসেছিলেন দরিদ্র শ্রেণী থেকে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব বিদ্রোহের শ্রেণীচরিত্র প্রতিফলিত করেছিল। দরিদ্র কৃষক, খনি মজুর, জলদস্যু প্রভৃতিরা তাইপিং বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। জাঁ শ্যেনোও তাইপিংদের নেতৃত্বের প্রশ্নটি পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, একদল দরিদ্র, হতাশ, জীবনযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি ঈশ্বর ভক্ত সমিতি গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। শ্যেনো তাইপিং বিদ্রোহের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের উপাদান খুজে পেয়েছেন। বিদ্রোহীরা অত্যাচারী জমিদার ও জনস্বার্থবিরোধী রাজপুরুষদের নিহত করেছিল। জমির দলিল থেকে আরম্ভ করে ঋণপত্র ও মহাজনদের কাছে রক্ষিত যাবতীয় নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। ধনীদের থেকে লুন্ঠিত দ্রব্য এলাকার দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হত। দরিদ্র কৃষকরা একটা বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিল যে, তাইপিংদের শাসন চীনে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। সম্রাটের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কোন অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলে, তারা প্রাথমিক বাধা পেত স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে। সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তাইপিং বিদ্রোহ সমন্ততন্ত্রবিরোধী সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের রুপ পরিগ্রহ করেছিল। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা তাইপিং বিদ্রহকে চীনের ইতিহাসে প্রথম কৃষিবিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

  যে সমস্ত এলাকা তাইপিং বিপ্লবীরা দখল করে নিয়েছিল, সেসব এলাকার নিহত বা পলাতক ভূস্বামীদের জমিগুলি ভাড়াটে চাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল। কিয়াংশুর দক্ষিণে এবং আনহুইওতে ভূমিকরের হার প্রচুর পরিমাণে হ্রাস করা হয়েছিল। কিয়াংশুর দক্ষিণ অংশে তাইপিং বিপ্লবীরা এসে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটে চাষীরা খাজনা দিতে অস্বীকার করেন এওবগ ভুস্বামীদের আক্রমণ করে তাদের বাড়িঘর অগ্নিদগ্ধ করেন। মূলত কৃষকদের চাপের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৬০-৬১ খ্রিঃ নাগাদ সর্বত্র, বিশেষত, যে অঞ্চলগুলি তাইপিংদের দখলে ছিল, জমির খাজনার হার হ্রাস করা হয়েছিল। সেদিক থেকে তাইপিং বিদ্রোহকে কৃষক অভ্যুত্থান হিসাবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক হবে না।

  তাইপিং বিদ্রোহে মাঞ্চু বিরোধী ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ছিল চীনকে মাঞ্চুদের অপশাসন থেকে মুক্ত করা। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩ খ্রিঃ মধ্যে তাইপিং বিদ্রোহের তিন প্রধান নেতা হুং শিউ চুয়ান, ফেং উন-শান এবং ইয়াং শিউ-চিং যে মাঞ্চু বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন সেই জেহাদ জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহে বিদেশী তার্তার বংশোদ্ভুত মাঞ্চু শাসকদের অপদার্থতার কথা তুলে ধরে বিশ্বের দরবারে চীনের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত করার জন্য মাঞ্চুদের সরাসরি অভিযুক্ত করেছিলেন।

তাইপিং-এর জাতীয়তাবাদী চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ওয়েই চ্যাং-হুই-এর মতো ধনী জমিদার এবং শি ডা-কাই-এর মতো বিক্ষুব্ধ পন্ডিত তাইপিং বিদ্রোহে যোগ দেন।

তাইপিং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত করা যায়। একদিকে কৃষকদের কল্পরাজ্য ও মাঞ্চু বিরোধী জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি প্রথাওগত ধ্যানধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্য আধুনিক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাইপিং বিদ্রোহের মধ্যে। হুং শিউ চুয়ান দীর্ঘদিন ক্যান্টনে থাকার সুবাদে পাশ্চাত্যের আধুনিকতা ও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। তাইপিং নেতৃত্বের মধ্যে পশ্চিমীদের উৎকর্ষ অনুসন্ধানের একটি তাগিদ ছিল। একদিকে সামাজিক মুক্তি এবং অন্যদিকে আধুনিক কৌশল আয়ত্ত করার জন্য তারা সচেষ্ট ছিল। তাইপিং বিপ্লবীরা প্রাথমিক সাফল্যের পর নানকিং-এ যখন তাঁদের স্বর্গীয় রাজধানী প্রতিষতাহ করেন, তখন তাঁরা "The Land System of the Heavenly Kingdom" নামে একটি দলিল প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল সু এই দলিলকে "এক ধরনের তাইপিং সংবিধান" নামে অভিহিত করেছে। এই দলিল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাইপিং দের মধ্যে সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে একতি স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাইপিং স্বর্গরাজ্যে জমি ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। উক্ত দলিলে বলা হয়েছিল, স্বর্গের নীচের সমস্ত জমি স্বর্গের নিচের যাবতিয় মানুষ একত্রিত হয়ে চাষ করবে। স্বর্গরাজ্যের রাজা হুং শিউ চুয়ান নিজেকে যীশু খ্রিস্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে ঘোষণা করে পশ্চিমীদের সাথে চীনাদের প্রায় সমপর্যায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন।

তাইপিং বিদ্রোহীদের সামরিক ও অসামরিক সংগঠনের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। যাঁরা কৃষিকার্যে অংশ নিতেন তাঁরাই আবার সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব পালন করতেন। ইস্রায়েল এপস্টেইওন হুং শিউ চুয়ানের সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের বিভিন্ন কৃষক নেতার, যথা—ইংল্যান্ডের জন বুল, জার্মানির থমাস মুঞ্জের এবং আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়া অঞ্চলের জন হাস প্রমুখের মিল খুঁজে পেয়েছেন। এ কথা সত্য যে, চিনের বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি তাইপিংরা ভেঙে ফেলতে পারেননি। তথাপি সাধারণ মানুষের জীবন সহজতর করার জন্য তাঁরা যে আপ্রাণ প্রায়াস চালিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

১১) তাইপিং বিদ্রোহের প্রাথমিক সাফল্য ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ১৮৫১ খ্রী; জানুয়ারি মাসে কোয়াংসি প্রদেশের জিন তিয়েন গ্রামে "তাইপিং তিয়েন কুও" বা মহতী শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাইপিং বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা উত্তরমুখী অভিযান আরম্ভ করেন। মাঞ্চু বাহিনী বিদ্রোহীদের গতিরুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৫১ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চু বাহিনী ইউঙ্গান শহরে বিদ্রোহীদের অবরুদ্ধ করে। কিন্তু ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকার পর তাইপিং বাহিনী অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসে পুনরায় উত্তরে অগ্রসর হতে থাকে। এইসব অঞ্চলের দরিদ্র, করভারে জর্জ্জিত কৃষকরা তাইপিং বিদ্রোহীদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাইপিংদের সাম্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের জন্য তাঁরা বিপিল জনসমর্থন লাভ করেছিলেন। দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও নিজেদের আধুনিক সামরিক কৌশলকে পুঁজি

করে তাইপিং বিদ্রোহীরা ইয়াংসি উপত্যকার বিখ্যাত শহর নানকিং দখল করেন। ১৮৫৩ খ্রিঃ মার্চ মাসে বিদ্রোহীরা নানকিং-এ স্বর্গরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে বিদ্রোহীরা অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের অবাধ অগ্রগতি মাঞ্চু শাসনের অবসান অনিবার্য করে তুলেছিল। কিন্তু একদল রাজপুরুষের কর্মদক্ষতা তাইপিংদের দুর্বার গতি রুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। তাইপিং বিদ্রোহ দমনে যে রাজপুরুষ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁর নাম সেং কুয়ো ফান। তিনি তাইপিংদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে নিজস্ব তাগিদে একটি রক্ষিবাহিনী তৈরী করেছিলেন। এই বাহিনী হুনান বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। তাইপিংদের ভাবাদর্শকে আঘাত করার জন্য সেং হুনান বাহিনীকে নতুন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রচার করেন, বিদ্রোহীরা চীনের প্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চাইছেন। এই বাহিনী চীনের ব্যক্তিগত বাহিনীতে পরিণত হয়। এর আগে কোন মাঞ্চু রাজপুরুষ এ ধরনের ব্যক্তিগত বাহিনী গঠন করতে পারেনি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে তাইপিং বিদ্রোহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, চেং-এর ব্যক্তিগত বাহিনীর মধ্যেই বিংশ শতকের চীনে সমরনায়কদের উত্থানের বীজ নিহিত ছিল।

কৌশলগত ভ্রান্তি তাইপিং বিদ্রোহের ব্যররথতা অনিবার্য করে তুলেছিল। নানকিং দখলের পরই বিদ্রোহীদের উত্তরমুখী অভিযান চালিয়ে পিকিং দখল করে নেওয়া এবং মাঞ্চু রাজদরবারে আক্রমণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। এছাড়াও মতাদর্শগত দুর্বলতা তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাইপিং আদর্শে খ্রিস্টান ধর্মের সুগভীর প্রভাব ছিল। এই প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই তাও ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধরা ভালো চোখে দেখেননি। আবার হুং যেহেতু নিজেকে যীশুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেহেতু পশ্চিমীরাও কখনোই তাইপিংদের প্রতি সহানুভুতিশীল ছিল না। ইম্যানুয়েল সু বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ধর্মিয় আদর্শ চীনা এবং বিদেশী উভয়কেই সমানভাবে বিরোধী করেছিল। তাছাড়া, তাদের সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কনফুসীয় আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক স্তরভেদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদের মন্দির ও মূর্তি ভাঙার বিষয়টিও সাধারণ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। ফলে তাইপিংরা চীনের প্রাচীন ঐতিহ্য নষ্ট করছে—প্রতিবিপ্লবীদের পক্ষে এ ধরনের প্রচার চালানো সহজ হয়েছিল।

তাইপিংদের অন্তদ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা তাদের পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তাইপিংদের দক্ষিণের রাজা ফেং ইয়ুন-শান এবং পশ্চিমের রাজা শিয়াও চাও কই যুদ্ধে নিহত হন। ১৮৫৬ খ্রিঃ প্রাচ্যের রাজা ইয়াং শিউ চিং একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। ইয়াং-এর প্রভাব খর্ব করার জন্য উত্তরের রাজা ধনী জমিদার ওয়েই চাং হুই নিজের এলাকার ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরী করেন। এমন অবস্থায় হুং শিউ চুয়ান ওয়েই-এর প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। ইয়াং এর উত্থানে ওয়েই ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তিনি ১৮৫৬ খ্রিঃ ইয়াং ও তার গোষ্ঠীভুক্ত অন্তত সাত হাজার জনকে হত্যা করেন। তাইপিং দের কাছে এটি ছিল একটি বিরাট বিপর্যয়। একই বছরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে ওয়েই নিহত হন। এঁদের মৃত্যুর পর নেতৃত্বের সংকট তাইপিং বিপ্লবীদের দূর্বল করেছিল।

তাইপিং ভাবাদর্শ ও জীবনযাপনের অসংলগ্নতা তাইপিংদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাইপিং ভাবাদর্শ অনুযায়ী এক পুরুষের একজন স্ত্রী রাখার বিধান ছিল কিন্তু ক্ষমতালাভের পর বহু তাইপিং নেতাই প্রচুর সংখ্যক উপপত্নী রাখতে শুরু করেন। তাইপিংরা মতাদর্শের দিক থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা সমতাভিত্তিক একটি ভূমুব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে নেতৃত্বের একটি বড় অংশ প্রচুর সংখ্যক ভূসম্পত্তির

মালিক হয়েছিলেন। যে আদর্শ হাজার হাজার দরিদ্র কৃষককে তাইপিং বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল, সেই আদর্শ থেকে নেতাদের বিচ্যুতি তাইপিংদের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছিল।

সাধারণ মানুষের মনোবলের ওপর নির্ভর করে একটি যৌথ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার কর্মসূচী থেকে ক্রমে তাইপিংরা বিচ্যুত হয়েছিলেন। নিজেদের বিজিত এলাকার ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাইপিং ব্যবস্থা একটি রাজনৈতিক-সামরিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। জঙ্গি গণ আন্দোলনের মাধ্যমে তাইপিংরা মধ্য চীনের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছিল। সাম্রজ্যিক বাহিনী যে মূহুর্তে ঐ অঞ্চল আক্রমণ করেছিল, সেই আক্রমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। স্বতঃস্ফুর্ত গণপ্রতিরোধের অভাব রাজশক্তির পক্ষে অভ্যুত্থান দমনের কাজ অনেকটাই সহজ করে তুলেছিল।

১২) তাইপিং রাজ্যে মহিলাদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর।

- প্রাচীন চীনা সমাজে নারীদের অবস্থান সর্বদাই পুরুষের নীচে ছিল। মাও সে তুং লিখেছিলেন, চীনের জনসাধারণের গলায় তিনটি ফাঁস জড়িয়ে আছে কিন্তু মেয়েদের আছে চারটি— রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং স্বামীর কর্তৃত্ব। সম্পত্তির উপর নারীদের কোন অধিকার ছিল না, ছিল না পারিবারিক বা গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চীনের নারীদের জীবন বাঁধা থাকত একটার পর একটা কর্তৃত্বের দ্বারা। তাইপিং বিদ্রোহীরা অতীত ইতিহাসে নারীজীবনের এই দাসত্বের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে নতুনভাবে সমাজ গড়ার কথা ভেবেছিলেন। তারা পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করেন, নিষিদ্ধ করেন বিবাহের সময় নারীদের বেচাকেনার প্রথা। তাঁরা ঘোষণা করেছিল নারী ও পুরুষের সম্পর্ক একে অপরের উপর আধিপত্যের ভিত্তিতে নয়, বরং পারস্পরিক সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চীনের ইতিহাসে এই বিপ্লবী আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন আইন অনুযায়ী চীনা নারীরা রাষ্ট্রীয় পুরীক্ষায় বসা ও পুরুষদের মতোই অসামরিক ও সামরিক পদে আসীন হতে পারতেন। বস্তুত তাইপিং বাহিনীতে নারী যোদ্ধাদের পৃথক ভাগ ছিল, যারা পুরুষের মতোই সংগ্রামে অংশ নিত। নতুন রাষ্ট্র বহুবিবাহের পরিবর্তে এক বিবাহ প্রথা চালু করে। ধর্ষণের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। পাশ্চাত্যে যেমন চার্চে গিয়ে বিবাহ করার প্রথা আছে, ঠিক সেই ধরণের বিবাহ অনুষ্ঠান নতুন ব্যবস্থায় চালু হয়।

১৩) নিয়েন বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

- নিয়েন বিদ্রোহের সময়কাল ১৮৫৩ থেকে ১৮৬৮। উত্তর চীনে ইয়াং সি নদীর আববাহিকা অঞ্চল থেকে পীত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি ছিল নিয়েন বিদ্রোহীদের বিচরণ ক্ষেত্র। এই ভূখন্ড শান্টুং, কিয়াংসু, আনহুই ও হোনানা প্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বহু বছর ধরে তারা মাঞ্চু সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

  নিয়েন ছিল কৃষকদের একটি গুপ্ত সমিতি। সম্ভবতঃ এটি ছিল "শ্বেত পদ্ম" সমিতির অন্যতম শাখা। "নিয়েন" কথাটির অর্থ Sacred Scrolls। এর দ্বারা সমিতির মূল সামরিক

এককগুলিকে বোঝানো হত। এই তাইপিং বিদ্রোহের সমসাময়িক ছিল। আর যেহেতু মাঞ্চু শাসকেরা তাইপিং বিদ্রোহ দমনের জন্য অনেকটা বেশি সময় ব্যয় করে, তাই নিয়েন বিদ্রোহীদের বেশ কিছু বছর ধরেই শক্তিশালী মাঞ্চু বাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়নি।

E.J.Hobsbawm নিয়েন আন্দোলনকে "সামাজিক দস্যুতা"-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এই আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল। ১৮৫৬ সালে নিয়েন দলপতিরা মিলিত হয়ে একটি মাঞ্চু বিরোধী, রাজবংশ বিরোধী ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে। সেই ঘোষণায় বিদেশী বর্বর মাঞ্চু রাজত্বের উৎখাত করে "মহান হান রাজ্য" গড়ে তোলার জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য অনুগামীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। চ্যাং-লো-সিং ছিলেন এদি বিদ্রোহের সর্বোচ্চ নেতা। মিং বংশের প্রতি আনুগত্য আর মাঞ্চু বিরোধী জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ধনী বণিক, বৃহৎ ভূস্বামী, রাষ্ট্রশক্তি, সরকারী শস্যভান্ডার, সরকারী কার্যালয় এবং কারাগারগুলি।

J.Chesneaux লিখেছেন যে, তা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব কৃষকশ্রেণী থেকে নয়, বরং গ্রামের অন্যান্য স্তরের মানুষদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিল, যেমন ভবঘুরে, বন্যাদুর্গত মানুষ, ভেঙে দেওয়া ভাড়াটে সৈন্য বা দলত্যাগী সৈন্য, তাইপিং বিদ্রোহী, লবণ, চোরাচালানকারী, ছোটমাপের গ্রামীন পন্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্ছন্নে যাওয়া সন্তান। এমনকি কিছু কিছু ধনী ব্যক্তিরাও গোপনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত এবং তাদের লুঠ করা জিনিষপত্র জমা রাখত।

নিয়েন বিদ্রোহ পনের বছর স্থায়ী হয়েছিল। নানা কারণে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়—১) ১৮৬৭ সালে তারা গেরিলা দলের সনাতনী চরিত্র ছেড়ে বড় বড় বাহিনী গড়ে তোলার দিকে মন দেয়। এই সময় থেকে শত্রূদের আক্রমণের সামনে তাদের দূর্বলতা প্রকাশ হতে থাকে। আগে যখন গেরিলা দল ছিল, তখন বিপদের সময়ে তারা গ্রামের মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারত, তখন বিপদের সময়ে তারা গ্রামের মানুষের মধ্যে মিশে যেত পারত, কিন্তু এখন বাহিনী বড় হওয়ায় তা করা সম্ভব নয়। ২)তাইপিং বিদ্রোহের ন্যায় নিয়েন বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমী শক্তিগুলি সামরিক পরামর্শ, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং অন্য নানাভাবে সাহায্য করেছিল। ৩) নিয়েন বিদ্রোহের ব্যররথতার সবচেয়ে বড় কারণ এই যে বিদ্রোহীরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে এসে সত্যিকারের নতুন সমাজের কোন দিশা জনসমক্ষে রাখতে পারেনি।

১৪) তুংচি পুনঃস্থাপন কি "প্রকৃত পুনঃস্থাপন" ছিল?

- তাইপিং কৃষক বিদ্রোহ দমন করার ক্ষেত্রে বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে উন্নত পশ্চিমী অস্ত্রশস্ত্র বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এ নিয়ে মাঞ্চু শাসকের শিক্ষা নেয় যে ভবিষ্যতে বিদ্রোহী কৃষকদের এবং হান ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তার মানুষদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে পশ্চিমী অস্ত্রসম্ভার নিয়ে বলীয়ান হওয়া দরকার। চীনা শাস্কদের কাছে মূল বিষয় ছিল আধুনিক সমরাস্ত্র, কামান, বাষ্পচালিত পোত ও উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করতে শেখা, কারণ এইসব অস্ত্রশস্ত্রের বলে বলীয়ান হয়েই ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা চীনকে পরাজিত করতে পেরেছে। এই সময় রাজশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মূল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় চীন সম্রাট তুং চির রাজত্বকালে। তাই সমসাময়িক চীনা পন্ডিতরা এই প্রক্রিয়াকে তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

রাজশক্তির পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল একদল অত্যন্ত যোগ্য রাজপুরুষ ও আমলার। কেন্দ্রীয় স্তরে এই সব দক্ষ রাজপুরুষদের কৃতিত্বের ফলে চীনের পতনোন্মুখ রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে সাময়িকভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। জাঁ শ্যেনো বলেছেন—পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত কারিগর ছিলেন রাজধানীর এবং বিভিন্ন প্রদেশের কিছু উচ্চপ্রদস্থ কর্মচারী। পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পুরাতন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন বিদ্রোহ এবং বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে চীনে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, তা মোকাবিলা করার জন্য নতুন ধরনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল একটি স্থিতিশীল কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। ব্যয়-সঙ্কোচন নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। শাসকশ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত লোকেদের বিলাসবহুল জীবনের পেছনে অপব্যয় বন্ধ করার এবং কৃষকদের বাহুল্য বর্জিত কঠোর জীবনযাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে মেইজি জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তোলার কোন আন্তরিক প্রয়াস চালানো হয়নি।

বিদ্রোহ কবলিত অঞ্চলগুলি থেকে গ্রামীন জনসাধারণ এলাকা ত্যাগ করে চলে যেতে শূরু করেছিল। ফলে চিনের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে কৃষির ব্যাপক অবনতি ঘটে। চীন সরকারের তরফ থেকে কৃষির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন এলাকায় সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষি সরঞ্জাম ও বীজ কেনার জন্য কৃষকদের সরকারি ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু এলাকায় খাজনার হার কমিয়ে উৎপাদিত পণ্যের দশ ভাগের তিন ভাগ করা হয়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের পতিত জমিগুলিকে কৃষির আওতায় নিয়ে এসে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল কনফুসীয় ভাবাদর্শ। কনফুসীয় ভাবাদর্শের মূল কথা ছিল অধিকাংশ জমিতেই কৃষকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তুং চি সরকারের কৃষি নীতিতে এই নীতি সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি। এ ব্যাপারে জেলায় জেলায় এমনকি গ্রামে গ্রামে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিছু কিছু এলাকাতে জমিতে কৃষক মালিকানা গড়ে উঠলেও তার পরিমাণ ছিল বেশ কম। কিন্তু বেশ কিছু এলাকায় সেখানে কৃষকরা জমি পেয়েছিল বা কিনেছিল, সেখানে পরবর্তীকালে পুরনো জমিদারী ফিরে আসে এবং বলপূর্বক কৃষকদের বিতাড়িত করে জমির মালিক হয়ে বসে। বিদ্রোহজনিত অভ্যন্তরীণ সংকটের পরিণতি হিসাবে জমির মূল্য হ্রাস পেয়েছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রগুলি ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর পরিমাণে কিনে নিতে শুরু করে। তারা তাদের জমিতে ভাড়াটে কৃষকদের বসায়; কিন্তু এই ভাড়াটে কৃষকরা জমিতে আজীবন চাষ করার ঐতিহ্যগত নিশ্চয়তা পায়নি।

যে সমস্ত এলাকা তাইপিং বিদ্রোহীদের কবল থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সেইসব এলাকায় তুং চি সরকার "পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যালয়" গড়ে তোলে। এই কার্যালয়গুলির প্রাথমিক কাজ ছিল শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঁচিল ও মন্দিরগুলিকে পুনর্নির্মিত করা। স্থানীয় জেন্ট্রিদের সহায়তায় শস্যভান্ডারগুলিতে পুনর্গঠন করার কাজ শুরু হয়। কৃষির উন্নতির জন্য এবং সুস্থ গ্রামজীবন গড়ে তোলার জন্য জলব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেওয়া হয়। হুয়েই এবং ইয়েলো নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার রূপকারেরা চীনের ঐতিহ্যগত বাণিজ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। উপরন্তু বণিকদের ওপর ধার্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। "লিজিন" নামে বাণিজ্য শুল্কের অস্তিত্ব থেকে গিয়েছিল। "লিজিন" বাবাদ রাষ্ট্র যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত, তার একটা বড় অংশ যেত প্রদেশগুলিতে। বিভিন্ন গিল্ড ও বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে 'লিজিন' আদায় করত জেন্ট্রি শ্রেণীভুক্ত লোকেরা সুতরাং 'লিজিন' দায়ের সাথে জেন্ট্রিদেরও শ্রেণীস্বার্থ জড়িয়ে ছিল। বাণিজ্য শুল্কের আধিক্য বাণিজ্য

সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজন বা উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বৈদেশিক আক্রমণ এবং তাইপিং বিদ্রোহ সহ বিভিন্ন গণ-অভ্যুত্থান মাঞ্চু সেনাবাহিনী ও আমলাতগন্ত্রের দুর্বলতার স্বরূপ উদঘাটিত করেছিল। এক কথায় মাঞ্চু রাজতন্ত্রের কর্তৃত্ব জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কর্ণধারেরা উপলব্ধি করেছিলেন যে উচ্চবর্গীয় বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়া রাজকর্তৃত্বের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। ফলে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই মূলত তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কর্মসূচী গড়ে উঠেছিল—তা হল জেন্ট্রি শ্রেণীকে শক্তিশালী করা। জেন্ট্রি শ্রেণীর সুবিধার্থে, জেন্ট্রিদের সহায়তায় এবং সর্বোপরি জেন্ট্রি শ্রেণীভুক্ত রাজপুরুষদের উদ্যোগেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছিল। শ্যেনো মন্তব্য করেছেন—"পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে জেন্ট্রি শ্রেণীকে শক্তিশালী করেছিল"। জেন্ট্রি শ্রেণী অধিক পরিমাণে জমি হস্তগত করেছিল। কিন্তু সেই অনুপাতে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল। কৃষকরা ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাছাড়া শিল্প ও বানিজ্য অবহেলিত থেকে গিয়েছিল। শিল্প ও বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কোন প্রয়াস নেওয়া হয়নি। গোটা দেশজুড়ে একটি সুবিন্যস্ত কর ব্যবস্থা ও আর্থিক নীতি গড়ে তোলা হয়নি। কনফুসীয় মতাদর্শের প্রভাব থেকেই সম্পদশালী জেন্ট্রির দল শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগে বিমুখ ছিলেন। ফলে চীনে আধুনিক পুঁজিবাদ গড়ে ওঠেনি। পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কর্মসূচী চীনের অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল রাজতন্ত্রের চূড়ান্ত ধ্বংস প্রাপ্তির আগে জেন্ট্রি শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের এক সাময়িক প্রয়াস।

১৫) আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

- তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রাজপুরুষেরা চীনকে শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এইসব রক্ষণশীল রাজপুরুষেরা চীনকে আধুনিক শিল্প দ্বারা সমৃদ্ধশালী করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু একই সাথে তাঁরা মনে করেছিলেন যে চীনের সনাতন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া একান্ত জরুরী। তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই রাজপুরুষেরা চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সামরিক শিল্পেই আধুনিক পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছিল সব থেকে বেশি। যদিও আত্মশক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল তুং চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে, তা সত্ত্বেও উনবিংশ শতকের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত চীনের শাসকশ্রেণী আত্মশক্তি বাড়ানোর প্রক্রিয়া চালিয়েছিলেন।

  ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল সু চীনের আত্মশক্তি আন্দোলনকে তিনটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। ১৮৬১ খ্রিঃ থেকে ১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়। ১৮৭২ খ্রিঃ থেকে ১৮৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল দ্বিতীয় পর্যায়। আত্মশক্তি বৃদ্ধির তৃতীয় পর্যায় চলেছিল ১৮৮৫ খ্রিঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।

আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে (১৮৬১-১৮৭২) পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে চীনা ছাত্রদের বিদেশে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপনেরও প্রয়াস চালানো হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যা ও কূটনীতিতে চীনা ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলার জন্য বেশ কিছু অনুবাদ কেন্দ্র ও নতুন বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ নির্মাণ ও অস্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, চীনের তদানীন্তন রক্ষণশীল রাজপুরুষের দল পাশাচত্য সভ্যতার উৎকর্ষ স্বীকার করে নিয়েছিল। তাঁরা মনে করতেন একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া আর কোন কিছুই পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছ থেকে শেখার নেই। "বর্বরদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই বর্বরদের উন্নতমানের কৌশল আয়ত্ত করা দরকার।

আত্মশক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ক্রমশ এই ধারণা স্পষ্ট করেছিল যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মূল ভিত্তি হল সম্পদ। একজনকে শক্তিশালী হতে হলে সম্পদশালী হতে হবে। আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অত্যন্ত আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে উন্নতমানের যোগাযোগ, পরিবহন ও শিল্প গড়ে তুলতে হবে—এই কথা চীনা রাজপুরুষেরা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লি হ্যাং চাং—"চীনের দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতার উৎস দারিদ্র্য"। ফলে আত্মশক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৮৭২-১৮৮৫) সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্পকে আগ্রাধিকার দেওয়ার সাথে জাহাজ নির্মাণ, রেলপথ, খনি, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই পর্যায়ে সরকারি মালিকানাধীন সামরিক শিল্পের পাশাপাশি সরকারি তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগও গড়ে উঠেছিল। জাহাজ শিল্প, কয়লা খনি, বস্ত্রশিল্প, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

আত্মশক্তি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ও (১৮৮৫-১৮৯৫) সামরিক ও নৌ শিল্প গড়ে তুলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৫ খ্রিঃ "বোর্ড অফ এডমিরালিটি" গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রিঃ পেইয়াং নৌবগর গঠিত হয়েছিল। কিন্তু একই সময় এই পর্যায়ে হাল্কা শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতিকে সম্পদশালী করার প্রয়াস চালানো হয়েছিল। দুটো নতুন ধরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ এই পর্যায়ে দেখা দেয়। সরকারি ও বেসরকারি বণিকদের যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগ। এই দ্বিতীয় ধরনের উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং সরকারি তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলির আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির থেকে পৃথক। কিন্তু এই দুই ধরনের উদ্যোগই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। বণিকদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্তৃপক্ষের বিভেদনীতি এবং বণিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ব্যর্থতার প্রধান কারণ।

চীনের শাসকশ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশয় ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করে বিদেশী আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করা। কিন্তু আত্মশক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চীনে যে সামরিক ও নৌশিল্প গড়ে উঠেছিল তা চীনে বিদেশীদের আগ্রাসীও কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারেনি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে গড়ে ওঠা অস্ত্রশিল্পগুলি বিদেশী শক্তিবর্গকে আদৌ আতঙ্কিত করেনি। পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে বা সরকারি তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা বেসরকারি শিল্পগুলিতে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব, অদক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থা, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছিল। তাই চীনা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট মানের অস্ত্র ও নৌবহর তৈরী করতে পারেনি। কুড়ি বছর ধরে

প্রতিরক্ষা শিল্পকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালিয়েও চীন তার করদ রাজ্য আন্নামকে রক্ষা করতে পারেনি।

আত্মশক্তি আন্দোলনের ব্যররথতার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন—আত্মশক্তি বৃদ্ধির গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যেই একটা সহজাত স্ব-বিরোধিতা নিহিত ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা রাজপুরুষেরা কনফুসীয় মতাদর্শ অনুযায়ী অনগ্রসর কৃষি নির্ভর সামাজিক ভিত্তির ওপরই আধুনিক পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে অক্ষত রেখে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল না। আত্মশক্তি আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতার জন্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চীন একটি স্বাধীন বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল একটি মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী।

আত্মশক্তি আন্দোলনের সাফল্য ছিল সীমিত, সামরিক দিক দিয়ে চীনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়নি। চীনের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নের প্রচেষ্টাও সম্ভব হয়নি। ১৮৯৪-৯৫ সালে জাপানের হাতে চিনের শোচনীয় পরাজয় আত্মশক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার স্বরুপ তুলে ধরেছিল।

১৬) ১৮৯৮-এর শত দিবসের সংস্কার এর পিছনে আদর্শগত পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাপানের হাতে চীনের পরাজয়(১৮৯৫) চীনের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছিল। তদুপরি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্রিয়াকলাপ চিনের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করেছিল। দেশকে এই বিপদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে তা নিয়ে একদল কমবয়সী চীনা দেশপ্রেমিক ভাবনা-চিন্তা আরম্ভ করেছিলেন। এইসব দেশপ্রেমিকের অধিকাংশই ছিলেন ছাত্র, বিশেষত যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ডঃ সান ইয়াৎ সেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিঃ Revive China Society নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করেন। এই সময় চীনের সম্পদশালী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর আলোকপ্রাপ্ত অংশ নতুন চিন্তা ভাবনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী,-- একদিকে তাঁরা মাঞ্চু-বিরোধী রাজনৈতিক অভ্যুত্থান এড়াতে চেয়েছিলেন, আবার অন্যদিকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী বিভাজনের হাত থেকে চীনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদে তাঁরা চীনকে একটি সংস্কার আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে ব্রতী হয়েছিলেন।

  এই সংস্কার আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কাং ইউ ওয়েই। অষ্টাদশ শতকীয় ইউরোপীয় দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব কাং-কে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তিনি চৈনিক ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে সুপন্ডিত ছিলেন। কাং চীন সম্রাটের কাছে কিছু সুপারিশ করে একটি প্রতিবেদন রচনা করেন। ১৮৯৫ খ্রিঃ ২রা মে ১৩০০ বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সমেত প্রতিবেদনটি চীনের রাজদরবারে পাঠান হয়। এই প্রতিবেদনে চীনের প্রতি আপমানজনক শিমোনোসেকির চুক্তি অনুমোদন করতে নিষেধ করা হয়। তাছাড়া, রাজধানী পিকিং থেকে সিয়ানে স্থানান্তরকরণ, আর্থিক, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও ডাক ব্যবস্থার সংস্কার, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার পঠন-পাঠন, পরীক্ষা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়েও সুপারিশ করা হয়েছিল। ততদিনে শিমোনোসেকির চুক্তি অনুমোদিত হয়ে

গিয়েছিল। ফলে কেবল সংস্কারের বিষয়গুলি পড়ে রইল। চীন সম্রাট উক্ত প্রতিবেদনের প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে নিজে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। কাং তাঁর প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু দেশের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন এবং অচিরেই বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। চীনের শিক্ষিত মানুষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর সংখ্যায় "পাঠচক্র" গড়ে তুললেন। এই "পাঠচক্র"গুলির সদস্যারা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবন করে একটি সংস্কারমুখি আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৮৯৬-৯৮ খ্রিঃ মধ্যে সংস্কারের স্বপক্ষে জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে অন্তত ২৫ টি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল "শিউ বাও" নামে পত্রিকাটি। আরেকটি পত্রিকাও সেই সময় যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—তার নাম "কুওয়েন বাও"। এই পত্রিকা দুটি বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংস্কারপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সংস্কার আন্দোলনকে নেতৃত্বদানের ব্যাপারে কাং ইউ ওয়েই ব্যতীত যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন ইয়ান ফু, তান শি-টং, লিয়ান চি-চাও প্রমুখ।

কিন্তু তৎকালীন চীনের সনাতনপন্থী শাসকবর্গ এই সংস্কার আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা চীনের প্রথাগত ঐতিহ্য এবং সামন্ততান্ত্রিক ভাবাদর্শের বাইরে কোন সংস্কারকে গ্রহণ করতে চাননি। এমতাবস্থায় সংস্কারপন্থী এবং সংস্কারবিরোধী রক্ষণশীলদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। তৎকালীন চীনের বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু-শি যথেষ্ঠ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তাই তিনি সংস্কারপন্থী রক্ষণশীলদের মদত দিয়েছিলেন।

সংস্কারপন্থীরা দেসের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতকগুলি পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক কাঠামো কিরকম হবে—তাই নিয়ে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থীদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। রক্ষণশীলরা মনে করতেন চিনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা স্বর্গের ইচ্ছায় তৈরি হয়েছিল এবং তা স্বর্গের মতোই অপরিবর্তনীয়। তাঁরা বলেছিলেন আইনের পরিবর্তন করার কোন অর্থ নেই, কারণ আইন সুশাসন আনতে পারে না, সুশাসনপ দিতে পারেন একমাত্র ব্যক্তি অর্থাৎ সার্বভৌম সম্রাট। রক্ষণশীলরা সম্রাটের পবিত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরা সম্রাটের ক্ষমতা সীমিতকরণের বিরোধী ছিলেন। সংস্কারপন্থীরা সম্রাতের অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, সংস্কারপন্থীরা কিন্তু কখনোই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার মতো উন্মুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাঁরা একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন, যেখানে আলোকপ্রাপ্ত এলিট গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা একতি জাতীয় পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন স্থানীয় এসেম্বলির মাধ্যমে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবেন।